বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

দ্বাবিংশ সংখ্যা

৩০শে মাহে নবুয়ত—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩০শে নবেম্বর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

কোরবাণীর আহ্বান

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির ৮ই নবেম্বর, ১৯৪০, তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

বাৎসরিক সম্মেলন

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

অদ্যকার আল্‌ফজলেই আমি একটি 'এলান' দেখিতে পাইলাম যাহাতে নাজেরগণ সালানা জলসা বা বাৎসরিক সম্মেলনের চাঁদার জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমি ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি যে, সালানা জলসার খরচ উহার আয় হইতে বাড়িয়া যায়। সারা বৎসর চেষ্টা করিয়া আঞ্জুমন অল্প-বিস্তর যে-কর্জ্জটুক পরিশোধ করে তাহা সালানা-জলসার সময় পুনরায় যেই-সেই-ই হইয়া যায়, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা বাড়িয়াই যায়। গত বৎসরও আয় হইতে ব্যয় প্রায় দশ হাজার টাকা অধিক হইয়াছিল। এবারও এ পর্য্যন্ত মাত্র চারি পাঁচ হাজার টাকা আমদানী হইয়াছে, কিন্তু জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে জলসার খরচ পঁচিশ হাজার টাকার কম হইবে না। এই অনুমানও গত বৎসরের আগের বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া করা হয় নাই। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে খরচের অনুমান চল্লিশ হাজার পর্য্যন্ত হয়, কারণ গত বৎসর জুবিলী অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া বহু লোক জলসায় যোগদান করিয়াছিল। তাই জলসার কর্ম্মীগণ খরচের অনুমান গত বৎসরের উপর না করিয়া, গত বৎসরের আগের বৎসরের উপর করিয়াছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, খোদাতা'লার ফজলে প্রত্যেক বৎসরই লোক পূর্ব্ব বৎসর হইতে অধিক আসে এবং ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, খোদাতা'লার ফজলে প্রত্যেক বৎসরই জমাত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তা'ছাড়া দীক্ষাকৃত লোকের যে-লিষ্ট প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রতি এবং বংশের-বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আমাদের জমাতে প্রতি বৎসর আট দশ হাজার লোক বৃদ্ধি হইতেছে।

এই সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া আয় একই রহিয়াছে—অর্থাৎ পনর-ষোল হাজার বা সতর-আঠার হাজার টাকা হইতেছে। এইরূপে প্রত্যেক বৎসরই সিলসিলার উপর পাঁচ-ছয় হাজার হইতে আরম্ভ করিয়া আট-দশ হাজার পর্য্যন্ত কর্জ্জ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, জলসায় যোগদান করিবার জন্য লোকের মনে যেমন আগ্রহ, উহার খরচ বহন করিবার জন্য তাহাদের মনে তেমন আগ্রহ নাই। খরচ যদি এইরূপে বাড়িয়া যায় তবে ভবিষ্যতে জলসার খরচ-নির্ব্বাহে অনেক অসুবিধা গঠিতে পারে। এই অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কতিপয় বন্ধু অনবরত এই পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন যে, সালানা-জলসার সময় জমাতের তরফ হইতে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা উচিত না, লোকগণ নিজেরাই নিজ নিজ খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। এই প্রস্তাব আপাততঃ ভাল বোধ হইলেও, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণতঃ হইলে আঞ্জোমন যদিও আট-দশ হাজার টাকার বোঝা হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু জমাত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার বোঝের নীচে পড়িবে। কারণ বাজার হইতে কিনিয়া খাইলে লোকের খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে এবং এইরূপে জমাত অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সুতরাং আমি সমস্ত জমাতকে এবং বিশেষ করিয়া কাদিয়ানের জমাতকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের দায়িত্ব অনেক অধিক। আমরা (অর্থাৎ কাদিয়ানবাসিগণ) মেজ্‌বান (host), আর বাহির হইতে যাঁহারা আসেন তাঁহারা মেহমান (guest)। অতএব আমাদের উপর অতিথি সৎকারের এক মহা দায়িত্ব ন্যাস্ত আছে। কোন বিশেষ উপলক্ষে—যথা বিবাহ, সন্তানের জন্ম বা কাহারো মৃত্যু উপলক্ষে বাড়ীতে দশ-বিশ জন মেহমান আসিলে লোক সানন্দে সেই বোঝা বরণ করে। এক অনাহার-ক্লিষ্টা ছিন্ন বসন পরিহিতা দরিদ্রা বৃদ্ধার ঘরেও যদি হঠাৎ জামাই আসিয়া উপস্থিত হয় তবে সে একথা বলে না, "এখন আমি জামাইকে খাওয়াইব কোথা হইতে?" বরং কর্জ্জ করিয়াই হউক, বা কোন জিনিষ বেচিয়া বা বন্ধক দিয়াই হউক, সে নিশ্চয়ই খরচ বহন করিবে। বস্তুতঃ এক গরীবেরও

মেহমান-নোওয়াজীর যে-দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে তাহার অর্দ্ধেকও যদি আমাদের জমাতের লোকদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তবু তাহারা বহুগুণ অধিক এই চাঁদায় যোগদান করিতে পারে।

কাদিয়ানের লোকগণের উপর সাধারণতঃ এই শেকায়ত হইয়া থাকে যে, তাহারা সালানা জলসার সময় নিজেদের খাওয়ার বোঝও সিলসিলার উপর ঢালিয়া দেয় এবং সালানা জলসায় মেহমানদের জন্য যদি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হয় তবে তন্মধ্য হইতে প্রায় চারি-পাঁচ হাজার টাকা কাদিয়ান-বাসীদের জন্যই খরচ হয়। কাদিয়ানের সকল লোকই যদি নিজেদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের ঘরে করে তবে সালানা-জলসার খরচ ষোল-সতর হাজার টাকায় হইতে পারে। এই আপত্তি অবশ্য ঠিক। কিন্তু ইহাতে অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। জলসার সময় স্ত্রীপুরুষ সকল লোকই কাজে ব্যস্ত থাকে। অতএব ঘরে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। আমরা কয়েক বারই এবিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এরূপ করিলে 'মেহমান-নোয়াজী' (অতিথি সৎকার) হইতে পারে না, কারণ স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ ঘরে খাওয়ার তৈয়ারীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে জলসায় আগত স্ত্রীলোকগণের পরিবেশন কার্য্য, তাঁহাদের সুখ-সুবিধা ও জলসার এন্তেজাম কার্য্যাদি ব্যহত হয়। তদ্রূপ পুরুষগণ যদি বাড়ী ঘরের কাজ হইতে সম্পূর্ণ 'ফারেগ' (অবসর) না হয় তবে তাহারাও জলসার এন্তেজাম কার্য্যে পূর্ণরূপে যোগদান করিতে পারে না। যদি তাহাদিগকে জলসার কাজ হইতে 'ফারেগ' করিয়া দেওয়া হয় তবে জলসার এন্তেজাম হইতে পারে না, আর যদি তাহাদিগকে জলসার কাজে নিযুক্ত করা হয়, তবে সিলসিলার উপর তাহাদের খাওয়ার বোঝ পড়া অপরিহার্য্য। অবশ্য একটি পথ আছে, তাহা যদি অবলম্বন করা হয় তবে তাহাদের খাওয়ার বোঝ সিলসিলার উপর পতিত হইলেও সেই বোঝ অধিক কষ্টকর হইবে না। অর্থাৎ তাহাদের খাওয়ার কারণে সিলসিলার উপর যে-পরিমাণ বোঝ পড়ে তাহারা যদি জলসার চাঁদায় সেই পরিমাণ হিস্সা গ্রহণ করে তবে এই অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে।

অতএব আমি সর্ব্ব-প্রথম কাদিয়ানের জমাতকে বলিতেছি, তাহারা এই চাঁদায় অধিক হিস্সা গ্রহণ করুক। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জমাতের উপর পূর্ব্ব হইতেই কয়েক প্রকার বোঝ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই বোঝ এমন বোঝ যাহা জমাতকে বহন করিতেই হইবে, কারণ জলসা সালানা কোন অবস্থায়ই বন্ধ করা যাইতে পারে না। অতঃপর আমি বাহিরের জমাত-সমূহকেও বলিতেছি, তাহারা যেন এই চাঁদার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন।

তাহরিক-জদীদের চাঁদার জন্য যেমন পুনঃ পুনঃ আবেদন ও উৎসাহ প্রদান হইতেছে এইরূপ আবেদন ও উৎসাহ প্রদান যদি এই চাঁদার জন্যও হইত—যথা সদর আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে যদি দুই তিনবার এই মর্ম্মের ঘোষণাদি প্রকাশিত যে, অমুক অমুক জমাত সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছে, অমুক অমুক জমাত দেয় নাই, বা অনেক কম দিয়াছে, তদ্রূপ যাহারা বিশেষ হিস্সা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নামও যদি প্রকাশিত করিয়া দেওয়া হয়, তবে আমার বিশ্বাস যাহারা শিথিল আছে তাহারা তৎপর হইয়া যাইবে। সালানা জলসার চাঁদার জন্য সারা বৎসরে দুই একখানা চিঠি লিখাকেই যথেষ্ট মনে করার কোন হেতু নাই! বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার বোঝ একটী সামান্য ব্যাপার নহে। এই বোঝ বহন করিবার জন্য জমাতকে বিশেষ কোরবাণী করিতে হয়। এই সময়ে লোকদিগকে এক দিক দিয়া জলসায় যোগদান করিবার জন্য সফর-খরচের চিন্তা করিতে হয় অপর দিক দিয়া নিজের এবং নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের শীতের কাপড়ের কথা ভাবিতে হয়। এতদ্ব্যতীত, মাসিক চাঁদা পূর্ণ-রূপে আদায় করিবার আশাও তাহাদের নিকই হইতে করা হয়।

মোট কথা, এই সময়ে জমাতের নিকট এক জবরদস্ত কোরবাণীর আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোরবাণীই জমাতের উন্নতির উপায় এবং আল্লাহ্‌তা'লাও কোরবাণীই পছন্দ করেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি কোরবাণীও বৃদ্ধি হয় তবে জমাতের উন্নতির গতি অনেক দ্রুত হইয়া যাইবে।

অতএব আমি বাহিরের জমাত-সমূহকেও বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের উপর অনেক ভার পড়িয়াছে, এবং সকল ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। অতএব তাহাদের উচিত যেন তাহারা কোন তাহরিকেই শিথিল হইয়া না পড়েন। মাসিক চাঁদা পূর্ণরূপে আদায় করিতেও তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত, সালানা-জলসার চাঁদায়ও যোগদান করা উচিত। তদ্রূপ সালানা-জলসায় আসা উচিত এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়া আসা উচিত। কারণ কেবল খরচের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নহে, যে-পর্য্যন্ত না লোক বহুল সংখ্যায় জলসায় যোগদান করে।

অতএব সালানা-জলসার চাঁদার প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগী হওয়া উচিত এবং জলসাতে যেন লোক বহুল সংখ্যায় যোগদান করে, তজ্জন্য বন্ধুগণের চেষ্টা করা উচিত।

তাহরিক-জদীদ

অতঃপর আমি তাহরিক-জদীদের চাঁদার প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। বর্ত্তমান মাসে এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী দেড় মাসে বন্ধুগণ এই চাঁদার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, ফলে এবৎসর কেবল যে গত বৎসরের সমান চাঁদা আদায় হইয়াছে তাহা নহে, বরং কতকটা বেশীও হইয়াছে। এই আড়াই মাসের বিশেষ চেষ্টার ফলেই ইহা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই। অবশ্য এই আড়াই মাস জমাত বহু কোরবাণী করিয়াছে; কিন্তু কতিপয় লোকই করিয়াছে, সকলে করে নাই। অতএব যাহারা এখনো এই তাহরিকে হিস্সা গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকেও ইহাতে হিস্সা গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করা উচিত। এখনো তাহরিক-জদীদের চাঁদায় ৩২ হাজার টাকা অনাদায় রহিয়াছে এবং বিগত বৎসর সমূহের চাঁদার মধ্যেও বিশ-বাইশ হাজার টাকা বাকী আছে। অতএব এই সমুদয় টাকা ওসল করার প্রতি কর্ম্মিগণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কাদিয়ানের জমাতের চাঁদা আদায় কেবল যে গত বৎসর হইতে কম, তাহা নহে, বরং বাহিরের কয়েকটি জমাত হইতেও কম। এইবারই সর্ব্ব

প্রথম কাদিয়ানের জমাত বাহিরের কয়েকটি জমাত হইতে পিছনে রহিয়াছে। আমার এক স্ত্রীর অসুস্থতা ইহার জন্য যথেষ্ট রূপে দায়ী। তিনি লজনা-আমাউল্লাহ্‌র সেক্রেটারী; অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি চাঁদা-আদায়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন জিন্দা জমাতের কাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করিবে একথা আমি মানি না। কোন বিশেষ কর্ম্মী রুগ্ন হইয়া পড়িলে, বা খোদা না করুক, মরিয়া গেলে, কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা ঠিক নহে। এখন আমাদের জমাতে যে-সকল কর্ম্মী আছেন, তাঁহারা কি চিরকালই জীবিত থাকিবেন? তাহারা যদি চিরকালই জীবিত না থাকেন তবে তাহাদের মৃত্যুর পর কি সিলসিলার কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে? জিন্দা সিলসিলার লক্ষণ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা নবীগণের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের সিলসিলাকে অধিকতর উন্নতি দান করেন, যেন দুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, আল্লাহতা'লার সিলসিলা নবীদের উপরও নির্ভর করে না। অথচ খোদাতা'লার দ্বীনের জন্য নবীগণই সর্ব্বাধিক কোরবাণী করেন। কিন্তু খোদাতা'লা একথা বুঝাইবার জন্য যে, তাঁহার দ্বীনের উন্নতি কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপরই নির্ভর করে না, নবীগণের অন্তর্ধানের পরই তাঁহাদের কায়েম-করা সিলসিলাকে অধিকতর উন্নতি দান করেন। রসুল করীমের (ছাঃ) নিজ জীবনে বহু কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু হজরত আবুবকরের (রাঃ) খেলাফতে তদপেক্ষাও অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছিল এবং হজরত ওমরের (রাঃ) যুগে তদপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল! হজরত আবুবকর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) রসুল করীম (ছাঃ) হইতে আল্লাহতা'লার অধিক প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু তথাপি আল্লাহতা'লা শুধু একথা বুঝাইবার জন্য যে, এই 'দ্বীন' তাঁহায়ই, কোন ব্যক্তি-বিশেষের কায়েম-করা নহে, তাঁহাদের নগণ্য চেষ্টায় অধিক 'বরকত' দিয়াছেন।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অন্তর্ধানের পর সাধারণতঃ এই ধারণা করা হইয়াছিল যে, এখন সিলসিলা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং শত্রুগণও এই মনে করিয়া খুসী হইয়াছিল যে, এখন চাঁদা আসা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং জমাতের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, দুই-এক বৎসর পরই জমাত সংখ্যার দিক দিয়াও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধর্ম্ম-প্রচারের দিক দিয়াও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন তাহারা এক নূতন কথা সৃষ্টি করিল যে, প্রকৃত পক্ষে, মৌলবী নুরুদ্দীন ছাহেব জমাতে একজন অতি বড় আলেম এবং সিলসিলার যাবতীয় উন্নতি তাঁহারই কারণে হইয়াছিল। তাই আল্লাহতা'লা হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) অন্তর্ধানের পর এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা করিলেন যাঁহাকে লোক অনুপযুক্ত, অনভিজ্ঞ ও অল্প-শিক্ষিত মনে করিত যেন দুনিয়াবাসীর নিকট একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা খোদাতা'লার সিলসিলা, মানুষের গড়া নহে। অবশ্য হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) খোদাতা'লার প্রিয় ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বুঝাইয়া দিলেন যে, সিলসিলা তাঁহার না, আল্লার। অবশ্য হজরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব একজন মস্ত বড় আলেম ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এল্‌ম-ও আল্লাহতা'লারই অনুগ্রহে ছিল এবং আল্লাহতা'লা পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন যে, সিলসিলা তাঁহার নয়, আল্লার। অতঃপর খোদাতা'লা এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাহাকে লোক তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিত, যাহার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না! এইরূপে আল্লাহতা'লা পুনঃ দেখাইয়া দিলেন যে, এই সিলসিলাকে উন্নতি দেওয়া আল্লার কাজ, তিনি ইচ্ছা করিলে মাটি হইতেও মহা মহা কাজ লইতে পারেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার কায়েম-করা সিলসিলা ঐশী সাহায্যেই চলে। অতএব কেহ যদি মনে করে যে, অমুক ব্যক্তি রুগ্ন হইয়া পড়িলে, বা চলিয়া গেলে বা মরিয়া গেলে সিলসিলার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, সে আল্লাহ্‌র উপর 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং যে-পর্য্যন্ত এই তাওয়াক্কুল আমাদের জমাতে থাকিবে সে-পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা নূতন নূতন কর্ম্মীও সৃষ্টি করিবেন। আমাদের জমাতের কর্ম্মী রুগ্নও হয়, মৃত্যু মুখেও পতিত হয়, কিন্তু তজ্জন্য কি জমাতের কাজ কখনো বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে? যখনি কেহ রুগ্ন হইয়াছে বা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, তখনি আল্লাহ্‌ আর এক জনকে দাঁড় করাইয়া তাঁহা দ্বারা কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন।

হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) একজন জগদ্বিখ্যাত আলেম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ আহ্‌সান সাহেব, মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব এবং কাজী সৈয়দ আমীর হুসেন সাহেব বড় দরের আলেম ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন ওফাত প্রাপ্ত হইলেন, এবং দ্বিতীয় জন মুরতাদ হইয়া গেল। অতঃপর হাফেজ রুশনআলী সাহেব, মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব মরহুম—যাঁহারা দশ বৎসর পূর্ব্বে অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতেছিলেন—প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। হজরত খলিফা আওয়ালের (রাঃ) ওফাতের পূর্ব্বে কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করিত না। কিন্তু তাঁহার ওফাতের পর কয়েক দিনের মধ্যেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে এমন ইজ্জত ও প্রভাব দিলেন যে, জমাত মনে করিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ছাড়া কোন জলসা কৃতকার্য্য হইতেই পারে না। কিছুকাল পর যখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমাতের নেজামী বা সংগঠন-মূলক কার্য্যে ব্যপৃত হইলেন এবং কেহ বা ওফাত-প্রাপ্ত হইলেন তখন আল্লাহ্‌তা'লা অবিলম্বে মৌলবী আবুল আতা সাহেব ও মৌলবী জালালউদ্দীন সাহেবকে দাঁড় করাইলেন। মোটকথা, এরূপ কখনো হয় নাই যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্ধান বা অপসারিত হওয়ার কারণে সিলসিলার কাজ বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মৌলবী গোলাম রসুল রাজেকী সাহেবও এরূপ দরের একজন আলেম। তিনিও প্রথমতঃ কোন আলেম ছিলেন না, কিন্তু পরে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার নিকট জ্ঞানের এরূপ সমুদ্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। শিমলাতে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাকে মিনতি করিয়া নিজ বাড়ীতে নিয়া যান এবং বলেন, আপনার আগমনে আমাদের বাড়ীতে 'বরকত' বা আশীষ বর্ষিত হইবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা কখনো আমাদের সঙ্গ ছাড়েন নাই এবং আমাদের এই সন্দেহ করিবার কোন সুযোগ দেন নাই যে, কেহ রুগ্ন হইয়া পড়িলে বা মৃত্যু লাভ করিলে সিলসিলার কাজ প্রতিহত হইবে।

অতএব লজ্‌না-আমাউল্লাহ্‌র উচিত ছিল, সেক্রেটারী পীড়িত হওয়া মাত্রই নূতন আর একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করতঃ মহল্লায় মহল্লায় চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করা। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এরূপ আন্তরিকতা আছে যে, যদি তাহারা কায়মনোবাক্যে কাজ করিত তবে তাহরিক-জদীদের চাঁদা আদায়ে তাহারা পুরুষদের পিছনে থাকিত না। কিন্তু তাহারা 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর উপর ভরসা করে নাই এবং সেক্রেটারী রুগ্ন হইয়া পড়ায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। ফলে তাহারা পাঁচবৎসর যাবৎ অনবরতঃ যে-খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছিল, এবার তাহা হইতে বঞ্চিত হইল।

তদ্রূপ কাদিয়ানের পুরুষদিগকেও আমি বলিতে চাই যে, তাহাদের তাহরিক-জদীদের চাঁদা আদায়ে শৈথিল্যের কারণও 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার অভাব। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা মনে করিয়াছিল যে, জিনিষ-পত্রের দাম বৃদ্ধি পাইবে, তাই এখন একবারেই খাওয়া-পরার সামগ্রী খরিদ করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, যতদিন আল্লাহতা'লা আমাদের জমাতের হেফাজত করিতে ইচ্ছুক থাকিবেন, ততদিন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তিনি এই সকল বিপদাপদ দূরে রাখিবেন এবং এরূপ অবস্থার কখনো সৃষ্টি হইতে দিবেন না যাহা জমাতকে ধ্বংস করিবার কারণ হইবে। আর কোন সময় এরূপ বিপদ সৃষ্টি হইবে বলিয়া যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, তবুও আমাদের সঞ্চিত ফসল কোনও কাজে আসিবে না। কেননা, শত্রু কেবল অর্থই বাজেয়াপ্ত করিবে না, বরং ফসলও বাজেয়াপ্ত করিবে। জার্ম্মানীর লোক এখন ক্ষুধায় মরিতেছে, তাহারা যদি এখন ভারত দখল করিতে পারে তবে, ফসলের প্রতিই তাহাদের সর্ব্বাধিক লোভ হইবে। অতএব তাহাদের এই কার্য্যও তাওয়াক্কুলের বিরোধী ছিল। আমি একথা বলি না যে, তাহাদের এরূপ করা উচিত ছিল না, বরং আমি বলি, যদি তাহারা এরূপই করিয়াছিল, তবে চাঁদা আদায়ের প্রতিও তাহাদের মনোযোগ থাকা উচিত ছিল এবং তাহাতে শৈথিল্য ঘটিতে দেওয়া উচিত ছিল না।

অতএব যাহারা এখন পর্য্যন্ত তাহরিক-জদীদের চাঁদা আদায় করে নাই, তাহাদের মনোযোগ আমি এবিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। তাহরিক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষের আর প্রায় একমাস বাকী। অতএব শৈথিল্য দূর করিয়া ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেওয়া তাহাদের উচিত এবং আল্লাহতা'লার উপর ভরসা করা উচিত যে, তিনি তাহাদের উপর 'ফজল' করিবেন এবং তাহাদিগকে শত্রুহস্তে ছাড়িয়া দিবেন না। আমি বাহিরের জমাত-সমূহকেও এবং বিশেষ করিয়া তাহরিক-জদীদের কর্ম্মী এবং আমীর ও প্রেসিডেন্টদিগকে তাহরিক-জদীদের বকায়া আদায় করিবার জন্য এবং ওয়াদা পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এখন তাহরিক-জদীদের ষষ্ঠ বর্ষ অতিবাহিত হইতেছে, আর মাত্র চারি বৎসর বাকী আছে। অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য পথ অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী অতিক্রম করা হইয়াছে। অতএব এখন আমাদের গতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর হওয়া উচিত, যেন আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদের পূর্ব্ব বৎসরে কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা আমাদের পরিণাম ভাল দেখিয়া দূরীভূত করিয়া দেন।

হজরত ইয়াকুব আঃ তাহার সন্তানগণকে যে-যে উপদেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি উপদেশ এই ছিল— لا تموتن الا وانتم مسلمون। অর্থাৎ তোমাদের উপর মৃত্যু এমন অবস্থায় আসা উচিত যখন তোমরা খোদাতা'লার পূর্ণ 'ফরমাবরদার' বা অনুগত থাক। কেননা, পরিণাম দ্বারাই কার্য্যের বিচার হয়।

অতএব তাহরিক-জদীদের চাঁদা আদায়ে এখন অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর আন্তরিকতা ও অধিকতর তৎপরতার সহিত কাজ করা উচিত। কারণ এই শেষ বৎসর সমূহে যাহারা অধিকতর 'এখলাস' বা আন্তরিকতা দেখাইবেন, তাঁহাদের যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কোন ত্রুটি থাকিয়াও থাকে, তবু খোদাতালা বলিবেন, যেমন মৃত্যুকালীন এখলাসের আমি কদর করি, তদ্রূপ আমি এই এখলাসেরও কদর করিব এবং তাহার পূর্ব্বকার যাবতীয় ত্রুটি মাফ করিয়া দিব। কোরান করীম হইতে বুঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তালা মানুষকে তাহার জীবনের উৎকৃষ্টতম কার্য্যের দিক লক্ষ্য করিয়া জাজা বা পুরস্কার দিবেন। অর্থাৎ নামাজের ছওয়াব দিবার সময় বিভিন্ন স্তরের নামাজের বিভিন্ন ছওয়াব দিবেন না, বরং জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নামাজ যাহা সে সম্পাদন করিয়াছে, তদনুযায়ীই তাহার সকল নামাজের পুরস্কার দিবেন। তদ্রূপ রোজার বেলায়ও জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রোজা যাহা রাখা হইয়াছে, তদনুযায়ীই ছওয়াব দেওয়া হইবে। হজের বেলায়ও তাহাই হইবে। মোটকথা, জীবনের শ্রেষ্ঠতম আমল বা কার্য্যের উপর প্রতিদানের ভিত্তি রাখা হইবে এবং দুর্ব্বল আমল-সমূহের প্রতিদানও শ্রেষ্ঠ আমল অনুযায়ীই প্রদান করা হইবে। সুতরাং শেষ-ভাগে কার্য্য অধিকতর উত্তমরূপে সম্পাদন করিলে তাহা পূর্ব্বকার সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মানুষের জীবনের যাবতীয় কার্য্যকে উত্তম করিয়া দেয়।

অতএব আমি সালানা-জলসার চাঁদা এবং তাহরিক-জদীদের চাঁদা এই উভয় চাঁদা আদায়ের প্রতি জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং সকল বন্ধুগণকেই উপদেশ দিতেছি যেন তাঁহারা এই উভয় চাঁদা আদায়-কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন এবং ফলে তাহরিক-জদীদের নূতন বৎসর ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত টাকা আদায় হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া কাদীয়ান-বাসীদের এই কার্য্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত এবং তাহাদের কোরবাণী অপরের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এই সকল চাঁদায় অধিক উৎসাহ সহকারে যোগদানের ফলে যেন সালানা-জলসায় যোগদানে শৈথিল্য প্রকাশ না পায়। আমাদের জমাত যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রতি পদক্ষেপে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়। জমাত যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, কাদিয়ানে আগমনকারী লোকদের সংখ্যাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্য ইহাও যে একটি বোঝা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বোঝা আমাদিগকে বহন করিতেই হইবে। এইরূপ বোঝা বহনের ফলেই আল্লাহ্‌তা'লার কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতেও যদি আমরা কাহারো বোঝা বহন করি তবে সে আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়। তদ্রূপ আল্লাহ্‌-তা'লার 'দ্বীনের' বোঝা বহন করিলে তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও আমাদের সকল বোঝা বহন করিবেন। এই পৃথিবীতে কেহ যদি তোমার বোঝা বহন করে, তুমি তাহাকে মুজুরি দিয়া থাক, এরূপ অবস্থায় তুমি কেমন করিয়া ধারণা করিতে পার যে, তুমি খোদার 'দ্বীনের' কাজ করিলে, তিনি তোমার মুজুরী দিবেন না? আল্লাহতা'লা সদা-সর্ব্বদাই এই ভার বহন করিবার মুজুরি দিয়া আসিয়াছেন এবং দিতে থাকিবেন। আমরা যখন এই পৃথিবীতে তাঁহার দ্বীনের ভার বহন করি, পর-জগতে যেখানে অনন্ত জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তিনি আমাদের ভার বহন করিবেন, ইহাই তাঁহার মুজুরী দান। এই সওদা কত সস্তা! আমাদের ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট বৎসরের ভার বহন করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌তা'লা লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বরং বহু অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ বৎসর ব্যাপিয়া আমাদের জীবনের সমস্ত ভার বহন করিবেন। এত সস্তা সওদার প্রতিও যদি আমাদের মন আকৃষ্ট না হয় তবে মনে করিতে হইবে আমাদের হৃদয়ে মরীচা ধরিয়াছে এবং এই জন্য এখন দোয়া করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। কারণ আল্লাহই তাহাদের এই মরীচা দূর করিতে পারেন।

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নারীজাতির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য *

মাননীয়া সভানেত্রী ও উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভগ্নিগণ!

নারী-জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই মহতী সভায়, যেখানে বহু শিক্ষিতা মহিলা যাহারা বহু দিন ধরিয়া আহ্‌মদীয়তের আলোতে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া পবিত্র পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে উজ্জ্বল রত্নাকারে বিরাজ করিতেছেন, আমার মত এক দীনা-হীনা ক্ষুদ্র ও অশিক্ষিতা বালিকার পক্ষে কিছু বলার দুঃসাহসিক ও হাস্যকর প্রচেষ্টা বড় রকমের ধৃষ্টতা হইলেও নগণ্যা শিক্ষার্থিনীর প্রথম প্রয়াস হিসাবে ক্ষমার্হ।

আমার মত ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে নারী-জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব, এত বড় বিষয় বর্ণনা করা সম্ভবও নয়, শোভনীয়ও নয়; কিন্তু জীবনের প্রারম্ভেই এই গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি বুঝিয়া লইতে না পারিলে জীবনের মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে বুঝারও কোন সার্থকতা নাই। জীবন শেষ করিয়া বুঝিলেই বা লাভ কি? তাই এত বড় বিষয় বর্ণনা করার মধ্যে নিজের বুঝগুলির বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র সার্থকতা। অন্যকে বুঝাইবার মত অভিমান আমার মত ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না এবং নাই। এইজন্যও আমার এই ধৃষ্টতা আপনাদের সস্নেহ সহানুভূতির করুণা-প্রার্থী।

মায়ের আসে-পাশে খেলা করিয়া বেড়াইবার বয়স হইতেই, অর্থাৎ যে-বয়স হইতে আমাদের কথা মনে আছে সেই বয়স হইতেই, একটা কথা আমাদের চোখে পড়ে, সেইটা হইতেছে—ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য। আমাদের মা-বাপের ঘরে যখন আমাদের কোন ভাইয়ের জন্ম হয়, সেই সময়ে আমাদের শিশু ও কচি মনও যতটা আনন্দে নাচিয়া উঠে—বোন হলে যেন ততটা আনন্দ অনুভব হয় না। ছেলে হওয়ার কথাটা শুনিলে মা-বাপের নিজেদের মনও যতটা খুসী হয়, মেয়ে হইয়াছে শুনিলে যেন ততটা খুসী হয় না। ধাত্রী বেটি মেয়ে জন্মিলে আর বখশিস চায় না, আত্মীয় স্বজনও মিঠাই খাওয়া বা কোন বড় রকমের ভোজের দাবী করে না—তবে কি বাপের ঘরে মেয়ে রূপে জন্ম নেওয়া বিধাতার একটা অভিশাপ—নারীজাতিটা কি মানব জগতের জন্য একটা ভীষণ অকল্যাণ?

واذا الموءودة سئلت بای ذنب قتلت

"এক সময় আসিবে যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে, কি অপরাধে তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে।"

কোরানের এই বাণী হইতেও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, জগতে বহু দিন ধরিয়া নারীজাতিকে লাঞ্ছনার মৃত্যু বরণ করিয়া দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন যাপন করিয়া আসিতে হইতেছে। এক দিন এই ভীষণ অত্যাচারের জন্য মানব-সমাজকে জবাবদিহী করিতে হইবে।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, দীর্ঘ দিন ধরিয়া নারীজাতির উপর এই যে ভীষণ নিপীড়ন চলিয়া আসিতেছে তাহার জন্য দায়ী কি কেবল পুরুষের স্বেচ্ছাচারীতা, না নারী-জাতির নিজেদের কর্ত্তব্যের অবহেলা? আমার বিশ্বাস পরের ঘা'রে দোষ চাপাইবার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যের কথা চিন্তা করিলে এই নিছক সত্য কথাটা আমাদের কাছে ধরা পরিবে যে, এই নারী-নিপীড়নের মূলে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা যতই প্রবল হউক না কেন, আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা এর জন্য কম দায়ী নয়।

জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ-কর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওছাল্লাম বিধাতার পূর্ণ বিধানে নারীজাতির যে-মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যের প্রতি সজাগ করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আজ এই মায়ের জাতি মাতৃত্বের সিংহাসন হইতে দাসীত্বের কারাগারে নিষ্পেষিতা হইত না।

আমরা আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে একটু মোড়াইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, আমরা মানব-সমাজে কেবল ঘৃণার বস্তুই নহি, বরং আমাদের যথোচিত সম্মান ও আদর দান করিয়া আমাদের সহযোগ ও সাহচর্য্য লাভ করার মধ্যেই মানব-সমাজের প্রকৃত মর্য্যাদা, সম্মান, শান্তি, এমন কি, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করে। আমাদের অমর্য্যাদা মানব-সমাজের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে—তাই এক দিক্ দিয়া যেমন আমাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে আর এক দিক্ দিয়া আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আদরের মোহও মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ফলে আজ আমরা সমাজের খুব ভাল কাজের অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

তাই বলিয়াছিলাম যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা বুঝিয়া না লইব, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের দায়ীত্ব সম্বন্ধে নিজেরা সজাগ না হইব এবং নিজেদের কর্ত্তব্য পথে নিজেরা চলিতে না শিখিব, ততদিন পর্য্যন্ত নারীজাতির শুধু নয়, বরং সমগ্র মানব-সমাজের কোনই কল্যাণ সাধিত হইবে না।

তবে নারীজাতির কর্ত্তব্য কি?

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ বলিয়া গিয়াছেন—

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। জ্ঞান বলিতে এখানে জগতের যাবতীয় শিল্প-বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও যুদ্ধ বিদ্যাদি বুঝায় না—বরং সামাজিক জীবনে গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে নর ও নারীর আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কর্ম্ম-ক্ষেত্রের উপযোগী ও দরকারী জ্ঞান লাভই বুঝায়।

হজরত রসুলে করীম ছাঃ বলিয়াছেন—

الجنة تحت اقدام امهات المؤمنين

"বেহেস্ত মাতৃ-জাতির পদতলে অবস্থান করিতেছে"। আমরা মাতৃজাতি যদি আমাদের কর্ত্তব্য পথ চিনিয়া লইয়া কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে পারি—তাহা হইলে মানব-সমাজে স্বর্গের রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে—মানুষের গার্হস্থ্য জীবন বেহেস্তের শান্তি-নিকেতনে পরিণত হইতে পারে। কর্ত্তব্য-পথ চিনিয়া লইবার জন্য জ্ঞান

* বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের মহিলা অধিবেশনে মোসাম্মত সৈয়দা মামুন আখতার কর্ত্তৃক পঠিত—সঃ আঃ

লাভ করার দরকার; তাই হজরত ছাঃ জ্ঞান-লাভকে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—নিজেরা জ্ঞান লাভ করা সন্তান সন্ততিদিগকে জ্ঞান দান করা—আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

বহু দিন ধরিয়া মানব-সমাজ নারীজাতিকে জ্ঞান লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে—এবং খেলার পুতুলের মত শিশুদের ন্যায় খেলার সামগ্রী হিসাবে যথেষ্ট সম্মানও দান করিয়াছে; এই সচল খেলনাও খেলওয়ারের মোহের আবেশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে।

তারপর আঁ-হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী—

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ—অনুযায়ী এমন দিন আসিয়াছে, যে-দিন এইজন্য সমাজকে নিজেদের বিবেকের কাছেই নিতান্ত করুণ স্বরে জবাব-দিহী করিতে হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের যুগই সেই যুগ। অতএব আমাদিগকে এই সুবর্ণ সুযোগের সাহায্য লইয়া জ্ঞান লাভের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলিয়াছি ইহাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

আমাদের আর একটা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় নম্বরে বর্ণনা করিলেও গুরুত্ব ও দায়ীত্বের দিক দিয়া সর্ব্ব প্রধান ও সব চেয়ে গুরুতর। দুনিয়ার যাবতীয় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার কোনই মূল্য থাকে না যদি আমরা এই কর্ত্তবের প্রতি অবহেলা করি। এই কর্ত্তব্য হইতেছে আমাদের ইহ-জীবনের পর পারের জীবন সম্বন্ধে। আমাদের ইহ জীবনের পরও যে এক অনন্ত জীবন রহিয়াছে। অতএব জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পণ্ড হইয়া যাইবে যদি আমরা আমাদের পরকাল সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যত্নবান না হই।

মৃত্যুর পরপারে যে-জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেই জীবনই আমাদের আসল জীবন, সেই অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার একটা স্তরমাত্র আমাদের ইহ-জীবন। আমাদিগকে পরবর্ত্তি জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পরবর্ত্তি জীবনের কর্ত্তব্যের সমষ্টিকেই ধর্ম্ম বলা হয়। এই কর্ত্তব্য বুঝাইয় দিবার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে নবী ও রসুলদিগের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে দায়ী। এই কর্ত্তবের দিক দিয়া মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের কোন মূল্য নাই, অর্থাৎ মানুষ যেন কেও কারও নয়। কবি গাহিয়াছে—

আমি একা এসেছি একা চলে যাব
ধারি নাক কারও ধার—

সকলই স্ব স্ব ইমান ও আমলের জন্য নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী বিবেকের স্রষ্টার কাছে নিজেদেরই স্ব স্ব সীমাহীন জীবনের সুখ দুঃখের জন্য দায়ী।

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমি ত এই জন্য মুসলমান নহি যে, আমার বাপ-ভাই মোসলমান, মোসলমান সমাজে আমাদের জন্ম হইয়াছে এই জন্য আমরা মুসলমান, স্বামী মোসলমান, স্বামী আহমদী এই জন্যই আমিও আহমদী, বরং আমাদিগকে ইসলাম ও আহমদিয়তের সত্যতা নিজের প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া নিজের প্রাণের বস্তু হিসাবে ইহাকে গ্রহণ ও আমল করিতে হইবে।

ইমান, নমাজ, রোজা, হজ, জাকাত, চান্দা ও তবলীগ ইত্যাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী এবং এই জন্য আল্লার কাছে আমাদের নিজেদেরই জবাবদিহী করিতে হইবে।

বহু দিন ধরিয়া নারিজাতি সম্বন্ধে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইহারা কেবল বিলাসিতা ও দাসীবৃত্তির জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তাহারা যে মানব-জগতের শ্রেষ্ঠতম অর্দ্ধাংশ এই কথা ভুলিয়া গিয়া আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-সম্মান হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ফলে তাহারাও পুরুষের বিলাসের সামগ্রী বা খেলার পুতুল হিসাবে আদরের অসম্মানকেই সম্মান রূপে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাই ইহাদের মূল্য কমিয়া গিয়াছে মা, বাপ এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছেও।

মানব-সমাজকে প্রকৃত মানুষের সমাজে পরিণত করিবার জন্য মানব-জাতিকে ইতরতার পঙ্কিল কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পুরুষের চেয়ে মেয়েদের দায়ীত্বও কম নয়, সম্মানও কম নয়, ইহা বুঝিয়া লইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলেই নারীজাতিও জগতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হইতে পারে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ এই জাগরণের যুগেও দীর্ঘ দিনের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যাহাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া ও নিজেদের জন্য নির্দ্ধারিত স্বতন্ত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর না হইয়া পুরুষের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাইয়া পুরুষের সঙ্গে কাড়াকাড়ী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক-ভ্রম হইতে উদ্ধার হইয়া আর এক-ভ্রমে পতিত হইতেছে, ফলে আর এক হট্টগুলের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের বুঝা কঠিন হইবে না যে, আল্লাহতালা নর ও নারীকে পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নারী প্রবেশ করিতে পারে না, আর নারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষের প্রবেশ করা অসম্ভব। নর ও নারী প্রত্যেকেই যার যার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থাকিয়া একে অন্যের সাহায্য করিলেই মানব সমাজে স্বর্গ-রাজ্য ও আমাদের গার্হস্থ্য জীবন বেহেস্তের শান্তি নিকেতনে পরিণত হইবে।

এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এই অল্প সময়ে ও অল্প শিক্ষা নিয়া আমার পক্ষে কঠিন। আমাদের নেতৃস্থানীয়া আহমদী মহিলাবৃন্দ আমাদিগকে আহমদিয়তের আলোতে আমাদের অগ্রগামিনী হইয়া সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দিকে যাহা ইস্‌লাম নারী জাতির জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে অগ্রসর হইবেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে দিয়া ইস্‌লামের নির্দ্ধারিত বিস্তৃত কর্ম্মসূচী দান করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে চলার সহায়তা করিবেন—আমি এই নিবেদন জানাইতেছি। উপসংহারে মাত্র এই কথা বলিয়া আমি আমার নিবেদন শেষ করিব যে—ইসলামের এই নব-জাগরণের দিনে আমাদিগকে আমাদের পুরুষ ভাইদের সমানে তাল রাখিয়া নিজ বৃহের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম-সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় আমাদিগকেও আল্লার কাছে এবং সমাজের কাছে সমভাবে দায়ী থাকিতে হইবে।

প্রতিশ্রুত মসিহ্
হজরত রসুলে করীমের ছাঃ, কবরে

('কাদিয়ানী-রদের' জোয়াবের যৎ-কিঞ্চিৎ)

[আল্লামা জিল্লুর রাহমান ছাহেব]

হজরত রসুলে করীমের, ছাঃ, হাদীছের পূর্ণ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ মৌলবী-মৌলানাগণ—প্রতিশ্রুত মসিহ্ মাওউদ, আঃ, হজরত নবী করীমের, ছাঃ, 'রৌজা' বা মাটির কবরেই দফন হইবেন বলিয়া জন-সাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে নিম্ন-উদ্ধৃত হাদীছের কতকাংশ তাহারা কখন কখন উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে এই হাদীছটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিলাম।

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم فى قبر واحد بين ابى بكر و عمر—

(مشكوة)

"আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হইতে রেওয়ায়েত হইয়াছে, হজরত রসুলে করীম, ছাঃ বলিয়াছেন, ইসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার পুত্র-লাভ হইবে এবং তিনি ৪৫ বৎসর অবস্থান করিবেন, এবং তৎপর তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবেন ও আমার সঙ্গে আমার কবরে মদফুন হইবেন। অতঃপর আমি ও ইসা ইবনে মরিয়ম এক কবরে আবুবকর ও উমরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্থিত হইব।" (মিশ্‌কাত)

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীছের সবখানা পেশ করেন নাই ; কেবল হাদীছের শেষাংশটুকু পেশ করিয়াছেন। এই হাদীছের প্রথম হইতে সবগুলি কথা, অর্থাৎ পূর্ণ হাদীছটি, তিনি কেন পেশ করিলেন না ইহার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

যাহাহউক, এখন আমরা এই হাদীছের প্রকৃত মর্ম্ম পেশ করিতেছি। ইহাতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হজরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে আঁ-হজরত ছাঃ-এর 'কবর-স্থানে' দফন করা হইবে। কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই কথা দ্বারা মৌলানা সাহেব নিজের জমাট অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

কারণ, প্রথমতঃ, এই হাদীছে 'কবর-স্থান' কথা নাই, বরং 'কবর' এই কথাই আসিয়াছে। আর 'কবর' অর্থ 'কবর-স্থান' কিছুতেই শুদ্ধ হইতে পারে না। তবে রসুল করীম ছাঃ-এর কবর শরীফ ক্ষোদিয়া তাহাতে হজরত ইসা আঃ-কে দফন করাকে শরীয়তে-ইস্‌লাম ও ইমানি-গয়রত কিছুতেই সমর্থন করে না—ইহা মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন, এই জন্যই তিনি এস্থলে 'কবর' অর্থ 'কবর-স্থান' করিলেন। কিন্তু এই হাদীছের দ্বিতীয় বাক্য—"আমি ও ইসা ইবনে মরিয়ম একই কবর হইতে আবুবকর ও উমরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্থিত হইব"—মৌলানা সাহেবের অর্থকে রদ করিয়া দেয়। এই বাক্যটিও আঁ-হজরত, ছাঃ, ও ইসা, আঃ, যে একই কবরে থাকিবেন তাহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এস্থলে 'কবর' অর্থ 'কবর-স্থান' করিবার কোনই সুবিধা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আঁ-হজরত ছাঃ-এর 'রওজা' মোবারক হজরত আয়েসা ছিদ্দীকা রাঃ-এর হুজরা শরীফেই অবস্থিত। হজরত আয়েসা ছিদ্দীকা রাঃ-এর হুজরা মোবারকে অর্থাৎ বর্ত্তমান আঁ-হজরত ছাঃ-এর কবর-স্থানে হজরত উমর রাঃ-এর দাফন হওয়ার পর আর কোন কবরেরই স্থান নাই, এবং এই জন্যই প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হজরত আয়েসা ছিদ্দীকা, রাঃ, সেই খানে দাফন হইতে পারেন নাই।

বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা আমার এই কথা অতি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়।

عن عمرو ابن ميمون الاودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يا عبد الله ابن عمر اذهب الى ام المؤمنين عايشة رضى الله عنها فقل يقرء عمر ابن الخطاب عليك السلام ثم سلها ان ادفن مع صاحبى قالت كنت اريده لنفسى فلاوثرنه اليوم على نفسى فلما اقبل قال له ما لديك قال اذنت لك يا امير المؤمنين قال ما كان شيئ اهم الى من ذالك المضجع فاذا قبضت فاحملونى ثم قل يستأذن عمر ابن الخطاب فان اذنت لى فادفنونى والا فردونى الى مقابر المسلمين—

"উমর ইব্‌নে ময়মুনিল-আওদী বলিয়াছেন, আমি হজরত উমর ইব্‌নে খাত্তাব্ রাঃ-কে দেখিয়াছি; তিনি বলিলেন, হে আবুদুল্লাহ ইব্‌নে উমর! তুমি উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েসা রাঃ-কে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে, উমর ইব্‌নে খাত্তাব্ আপনাকে ছালাম জানাইতেছেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ কর, যে আমি আমার বন্ধু আঁ-হজরত ছাঃ-এর কাছে দফন হইতে চাই। হজরত আয়েসা, রাঃ, এই কথা শুনিয়া বলিলেন, এই জায়গাটি আমি আমার নিজের জন্য নিয়ত করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আমি আমার নিজের উপর তাঁহাকে (হজরত উমরকে) অগ্রগণ্য করিলাম। তারপর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলিলেন, আপনার জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, হে আমীরুল মোমেনীন! তখন হজরত উমর, রাঃ, বলিলেন, এই বিশ্রামের স্থানের চেয়ে বেশী মূল্যবান আমার কাছে আর কিছুই নাই। অতএব আমার মৃত্যু হইলে তোমরা আমাকে উঠাইয়া লইয়া যাইও, তারপর আমার ছালাম বলিয়া তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিও যে, উমর ইব্‌নে খাত্তাব অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহা হইলে আমাকে তথায় দফন করিও; আর যদি অনুমতি না দেন তাহা হইলে মোসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাইও।"

সুতরাং এই হাদীছ হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হজরত রসুলে করীম ছাঃ-এর কবর-স্থানে,—হজরত আয়েসা ছিদ্দীকা রাঃ-এর হুজ্‌রার মধ্যে, হজরত উমর রাঃ-এর দফন হওয়ার পর আর একটি কবরেরও স্থান নাই, এবং এই জন্যই উম্মুল-মোমেনীন হজরত আয়েসা ছিদ্দীকা, রাঃ, অন্যত্র দফন হইয়াছেন।

তবে "হজরত মসিহে মাওউদ, আঃ, আঁ-হজরত ছাঃ-এর কবরে দফন হইবেন" এই কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন—

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ - مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ - ثُمَّ السَّبِيْلَ

يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ - (پارہ عم)

"কি দিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন? শুক্র দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাহাকে শক্তি দান করিয়াছেন; এবং অতঃপর তাহার জন্য পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন; এবং অতঃপর তাহাকে মৃত্যু দিবেন, এবং কবরস্থ করিবেন; এবং অতঃপর যখন আল্লাহ চাহেন তাহাকে উত্থিত করিবেন।"

এই আয়াতগুলির মধ্যে অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতালা প্রত্যেক মানুষকে যেমন শুক্র হইতে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু দেন, এই রকম তিনিই প্রত্যেক মানুষকে কবরস্থ করেন। যাহাদিগকে অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হয়, যাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইয়া ফেলে, যাহারা সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া জল-জন্তুর উদরস্থ হয়, অর্থাৎ যে-ভাবেই কেহ মরুক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহতা'লা কবরস্থ করেন। অতএব মানব হস্তে ক্ষোদিত কবর ছাড়া আরও কবর আছে, যেখানে প্রত্যেক মানুষের আত্মাকেই যাইতে হয়; সেই কবরের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির গোর-আজাব কিংবা বেহেস্তী সৌরভের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই আঁ-হজরত বলিয়াছেন—

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر

النيران—(ترمذی)

"কবর বেহেস্তের একটি বাগিচা কিংবা দুজখের একটি গর্ত্ত।"

সুতরাং কবর বলিতে সব সময়ই মানব-ক্ষোদিত কবর বুঝায় না, বরং মরণের পর-পারে মানবাত্মা যে-স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানকেও কবর বলা হয়। অতএব, আঁ-হজরত ছাঃ-এর কবরে মসিহ মাওউদ দফন হইবেন, এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, আঁ-হজরত ছাঃএর পবিত্র আত্মা পর-জগতে যে-স্থানে অবস্থান করিতেছেন, হজরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর পবিত্র আত্মাও মরণের পর তাঁহার প্রভু হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ-এর সঙ্গে অবস্থান করিবেন।

সুতরাং, এই হাদীছের মধ্যেও কাদিয়ানে আবির্ভূত হজরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর দাবীর বিরুদ্ধে কোন কথাই নাই, বরং এই হাদীছের— يتزوج ويولد له —"তিনি বিবাহ করিবেন ও পুত্র সন্তান লাভ করিবেন" কথা দ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মাওউদের (আঃ) দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ হজরত মসিহে মাওউদ, আঃ, আঁ-হজরত ছাঃএর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীও তিনি অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন, পুত্র লাভ করিয়াছেন। এই পুত্রের কথাই হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ অলি তাঁহার বিখ্যাত 'কাছিদায়' হজরত ইমাম মাহদীর লক্ষণাদি বয়ান করার পর লিখিয়াছেন—

دور او چون شود تمام بکام

پسرش یادگار می بینم

"তাঁহার (হজরত ইমাম মাহদীর) জমানা যখন সফলতার সহিত শেষ হইবে, তখন তাঁহার পুত্রকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত দেখিতেছি।"

পাঠক অবগত আছেন, আহমদী জমাতের বর্ত্তমান খলিফা হজরত আমীরুল-মোমেনীন মির্জা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আইয়াদাহুল্লাহু বেনাছরিহিল্ আজিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা, যাহা আজ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। তিনি হজরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর সেই পুত্র যাঁহার কথা আঁ-হজরত, ছাঃ, ও মসিহে মাওউদ (আঃ) এবং শাহ নেয়ামতুল্লাহ অলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

দুনিয়াতে পুত্র ত সকলেরই হয়, কিন্তু মসিহে মাওউদের (আঃ) পুত্র হওয়া সম্বন্ধে আঁহজরত ছাঃ-এর ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্যে পরিষ্কার এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, হজরত মসিহে মাওউদ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুত্র লাভ করিবেন। খোদার ফজলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুত্র লাভ হইয়াছে, যাঁহার খেলাফতের যুগে দুনিয়ার কোণায় কোণায় আহমদীয়ত বা প্রকৃত ইস্লাম বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

হাদীসুল-মাহ্‌দীর যৎকিঞ্চিৎ

নবুওয়ত

[আল্লামা জিল্লুর রাহমান ছাহেব]

"দুনিয়াতে আর কখনও নবীর আবির্ভাব হইবে না, মহামানব হজরত মোহম্মদ মোস্তাফার আবির্ভাবের পর (ছাঃ) আল্লাহ্‌তালার এই অনুগ্রহ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে"—এই ভ্রান্ত ধারণাটাও মোসলমানদের জন্য হজরত ইমাম মাহ্‌দীকে গ্রহণ করিবার একটা প্রধান অন্তরায়। এই ভুল বিশ্বাসটা সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের মধ্যে এত ব্যাপ্ত ও দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, হজরতের পরে আর কোন নবী আসিতে পারে এরূপ চিন্তা করিতেও অনেকেই শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা অন্ধ বিশ্বাসের অর্গল হইতে হৃদয়ের দ্বার আল্লাহ, রসুল ও বিবেকের পবিত্র বাণীর জন্য মুক্ত করিয়া দিবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে এই মহাসত্য ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে যে, মানব-জাতির ইহ-পরকালের একমাত্র কল্যাণ বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম রহমত, নবুওতের চিরমুক্ত দ্বার কখনও রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, হইতে পারেও না। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহইত মানুষকে গুমরাহীর পঙ্কিলতম কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বারে বারে তমসাচ্ছন্ন আধ্যাত্ম জগতে রেসালতের তরুণ তপন উদিত হইয়া দিশেহারা মানব-মণ্ডলীকে আল্লাহ্‌র দিকে পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু দিগ্‌ভ্রম হইলে যেমন সূর্য্যই যেন ভুল করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়, মানুষও বারে বারে তাই করিয়াছে।

আমি আশ্চর্য্য হই, যখন দেখি যে, মোসলমান জাতি "খায়রুল উমাম" বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া দাবী রাখিয়াও আল্লাহ্‌তালার এই শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত মনে করেন, আর বিশ্বাস করেন যে, বিশাল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ, হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা ছাঃ-এর আবির্ভাবে এই রহমত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে কি তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের আর দরকার নাই? আর কি তাহাদের পতনের ভয় নাই? ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতে তাহারা কি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে? না, তাওত নয়, বরং হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহাদের শোচনীয় পতন অভিশপ্ত ইহুদীদের চেয়ে একটুও যে কম নয়! তবে তাহাদের উদ্ধারের জন্য নবী আসিবেন না কেন? আল্লাহ ও রছুলের অভ্রান্ত মীমাংসা এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে, এবং যাহারা গতানুগতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া কোরাণ ও হাদীছের মীমাংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারাই এই অখণ্ডনীয় সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, আল্লাহতালার চির পবিত্র নিয়ম—লক্ষ্যভ্রষ্ট মানব-জাতির প্রতি নবী পাঠাইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করা—বন্ধ হইয়া যায় নাই, বরং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ঠিক পূর্ব্বেরই মত প্রচলিত রহিয়াছে।

তবে মানব-জাতির শৈশব ও কৈশর অবস্থা পার হইয়া যাওয়ার পর মানবতার পরিণতির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিশ্ববাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্য যে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ বিধানের দরকার ছিল তাহা মঙ্গলময় বিধাতা হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা ছাঃ কর্ত্তৃক পূর্ণ করিয়াছেন। আর নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। কারণ হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ-এর প্রদত্ত ধর্ম্ম অতীত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের নিত্য সত্য সমূহ ও ভবিষ্যৎ জগতের জন্য চিরকল্যাণকর আইন কানুনের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্ম লইয়া আর কোন নবী আসিবেন না, আসিবার দরকারও নাই। মানব জাতির জন্য পূর্ণ ধর্ম্ম আসিয়াছে।

اليوم اكملت لكم دينكم

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের ধর্ম্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়াছি।"

কিন্তু অতীত জগতের ইতিহাস ও কোরাণ শরিফ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সব নবীই নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্ম লইয়া আবির্ভূত হন নাই, বরং প্রাগইস্‌লামিয় যুগে এই রকম বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মকে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মানবকে সেই পূর্ব্বতন ধর্ম্মে পরিচালিত করিয়াছেন। যাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কারক নবী নামে আখ্যাত করিতে পারি। এইরূপ নবীর কথা কোরাণে এই ভাবে উল্লেখ আছে:—

انا انزلنا التورا ة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون

অর্থাৎ "আমি তৌরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে আলো ও হেদায়ত (পথপ্রদর্শন) রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই নবীগণ আদেশ করিতেন।" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৌরাতের শরিয়ত অর্থাৎ ধর্ম্ম মতে আদেশ করিবার জন্য বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের নিজের কোন ধর্ম্মমত বা শরিয়ত ছিল না।

তৌরাতের ধর্ম্মমতে পরিচালিত করিবার জন্য, যাহা নির্দ্দিষ্ট সময় ও জাতির জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, যদি নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে তবে কোরানের ধর্ম্মমতে পরিচালন করিবার জন্য, যাহা জগতের সমস্ত জাতি ও কালের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে এবং এই ধর্ম্মের অনুগামীগণের জন্য ঠিক আগেরই মত গোমরাহ হইবারও কথা রহিয়াছে, নবী যে আসিতে পারে এবিষয়ে কোনও বিবেকশীল লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিশেষতঃ পবিত্র কোরাণ শরিফে যখন নবীগণের আবির্ভাবের নিম্নলিখিত কারণগুলি বর্ণিত হইয়াছে, যথা:—

১। আল্লাহ্‌র মোজেজা বা নিদর্শন দ্বারা ইমানকে দৃঢ়িভূত করা।

২। নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন ও আত্মাকে পবিত্র করা।

৩। আল্লাহ্‌র কালামের প্রকৃত জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

৪। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে যখন ঘোর মতভেদ উপস্থিত হয় তখন সেই মতবৈষম্যের মীমাংসা করিয়া দেওয়া।

৫। ধর্ম্মভ্রষ্ট মানব-জাতিকে সত্যপথ প্রদর্শন করা।

৬। ধর্ম্মপ্রাণ সাধুজনকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সুসংবাদ-যুক্ত ঐশী আশ্বাসবাণী জ্ঞাপন করা।

৭। অবিশ্বাসী দুষ্কৃতদিগকে আল্লাহ্‌র আজাবের ভয়পূর্ণ সতর্কবাণী জ্ঞাপন করা। *

আমরা দেখিতে পাই হজরত রছুল করীম ছাঃ-এর পর মোসলমানদের মধ্যেও এই সমস্ত কারণ বিদ্যমান আছে। অতএব তাহাদের মধ্যেও যে নবীর আবির্ভাব হইবে ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহুদি জাতির পতন হইলে আল্লাহ্‌র নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু মোসলমান জাতির পতন হুবহু ইহুদিদের মত হইলেও আল্লাহ্‌তালা তাহাদের উদ্ধারের জন্য কোন নবী পাঠাইবেন না,

---

* كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه - (الاية بقرة ع ٢٦)

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ط بقرة ع ١٥

তাহাদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য শুধু দাজ্জালই আসিবে, উদ্ধারের জন্য কোন নবী আসিবেন না, জগতের শ্রেষ্ঠতম নবীর উম্মতের প্রতি করুণাময়ের এরূপ বিরূপ ভাব কোন চিন্তাশীল মোসলমান বিশ্বাস করিতে পারে না।

নবীর আবির্ভাবের যে-সাতটি কারণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই এই শেষ যুগে বিশেষতঃ মোসলমানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

মোসলমানগণ কমজোর হইয়া পড়িয়াছে, তাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আবার তাহাদের ঈমানকে দৃঢ় করিবার জন্য নবীর আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।

মোসলমানদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইয়া তাহাদের আত্মাকে অপবিত্র করিয়া দিয়াছে। তাই ঐশী প্রেম জাগাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্র ও আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য পূর্ণ আদর্শ বা নবীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। আল্লাহ্‌র কালামের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে মোসলমান অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তাহাদের এত মত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে যে, এখন আবার আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন নবী আসিয়া মীমাংসা না করিলে প্রকৃত ইস্‌লামকে বুঝাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

মোসলমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে বলিয়াইত আজ মোসলমানদের এই শোচনীয় অবস্থা। ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই নবীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মপ্রাণ, স্বল্প-সংখ্যক, দুর্ব্বল, শিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আল্লার অভয়বাণী না আসিলে এই অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে তাঁহারা বাঁচিবে কি করিয়া? দুর্ব্বল শিষ্টের জন্য আল্লাহ্‌র অভয়বাণী আনয়ন করাই নবীদের আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে দুষ্ট ধার্ম্মিকদিগকে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভীতিপূর্ণ সাবধান বাণী জ্ঞাপন করাও নবীদের আবির্ভাবের আর একটি উদ্দেশ্য। অধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমানে কে অস্বীকার করিবে?

অতএব কোরানে বর্ণিত নবীর আবির্ভাবের এই সাতটি শ্রেষ্ঠতম কারণ বিদ্যমান হইয়া অতি দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে যে, মহানবীর পরেও সংস্কারক নবীর আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের এই বর্ত্তমান যুগই আর এক নবীর যুগ।

এতদ্ব্যতীত কোরাণ শরীফ, হাদীছ শরীফ ও বিজ্ঞ ইমাম ও গবেষণাকারী আওলিয়াগণের নিম্নলিখিত উক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, হজরত রছুল করিম ছাঃ-এর পরেও সংস্কারক নবী আসিবার কথা রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষাও গৃহ-চিকিৎসা"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ⁄০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

জগৎ আমাদের

ঢাকা নবী-দিবস

সাম্প্রদায়িক মিলন-সভা

এবার নাজের-দাওয়াতু-তবলীগের বিশেষ অনুমতিতে ৩১শে নবেম্বর তারিখে ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হলে স্থানীয় আহমদীগণ কর্ত্তৃক নবীদিবসের সভার আয়োজন করা হয়। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রফেসার বাবু রাসবিহারী ঘোষ এম-এ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অতঃপর স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের মিনিষ্টার বাবু অক্ষয় কুমার সেন আহমদীয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য অতি মহান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত করিয়া সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে এক প্রীতির বন্ধন স্থাপনই এই অনুষ্ঠাণের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন, আমার বিশ্বাস ধর্ম্মের ভিতি ভিন্ন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলন স্থাপন অসম্ভব, কারণ pact, percentage, আপোষ-মীমাংসা ইত্যাদি সবই ব্যর্থ হইয়াছে। যীশু, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ চৈতন্য ইঁহারা সকলেই আমাদের জন্য সুশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। তাঁদের সকলেরই পুণ্যময় জীবনী ও পবিত্র শিক্ষা আলোচনা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। অতঃপর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সম্বন্ধে তিনি বলেন, জগতে ঈশ্বরের মহিম প্রতিষ্ঠা করিতেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং নিজ জীবনের ভিতর দিয়া তিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস, হৃদয়ের পবিত্রতা, প্রেম, বৈরাগ্য ও দীনতা এই পাঁচটিই, ধর্ম্মের উপাদানা এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁর জীবনের ভিতর দিয়া এই পাঁচটি উপাদান পূর্ণরূপে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তাঁর জীবনী পাঠ করিলে হৃদয়ে বল ও শক্তি লাভ হয়, এবং প্রাণে প্রেরণা জন্মে, তাই অদ্য আমি তাঁর জীবনী আলোচনা করিতে আসিয়াছি।

অতঃপর আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব—আহমদীয়া মিশনারী, বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (ছঃ) শিক্ষা হইতে তিনি এই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ধর্ম্ম কোন বাহিরের জিনিষ নয়। এই দুনিয়াতে শান্তিতে বাস করিতে হইলে যে-শিক্ষা ও নিয়ম কানুনের দরকার এবং যে-শিক্ষার প্রভাবে ভাল মানুষ হইয়া এই পৃথিবীর জীবন এবং মরণের পরপারের সীমাহীন জীবনেও মানুষ অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে সেই নিয়ম-কানুন এবং তাহা পালন করার নামই ধর্ম্ম। খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় কর্ম্মই ধর্ম্মের অন্তর্গত। তাই কেমন করিয়া ভাল পিতা হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল পুত্র হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল স্বামী হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল স্ত্রী হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল রাজা হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল প্রজা হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল প্রভু হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল ভৃত্য হইতে হইবে, কেমন করিয়া ভাল প্রতিবেশী হইতে হইবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কেই ইসলাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছে এবং মানবতার এই সমস্ত দিক দিয়াই হজরত মোহাম্মদের ছাঃ জীবনে পূর্ণ আদর্শ রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন যে, প্রয়োজন মত যুদ্ধ করাও ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বাহিরের ও ভিতরের শয়তানকে পরাভূত করিয়া হৃত-স্বর্গের পুনরুদ্ধার করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) যে ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইল—"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু।"

অতঃপর পাবনা সৎ-সঙ্ঘের প্রচারক বাবু রত্নেশ্বর দাস-গুপ্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ধর্ম্ম বহু নয়, এক, ধাতা একত্র, মন্ত্র এক। যুগে যুগে প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে যথাবিহিত সম্মান কর এবং আমার অনুসরণ কর।" হজরত মোহাম্মদ যে-কথা বলিয়া গিয়াছেন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যিশুও তাহাই বলিয়াছিলেন এবং কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছিলেন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখনই জ্যোতিষ্মাণ পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। উপসংহারে তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত এই মিলন-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অতঃপর মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব—আহমদীয়া মিশনারী বক্তৃতা করেন। তিনি কোরানের তিনটি আয়েত পেশ করিয়া বলেন যে, জগৎ যদি এই তিনটি শিক্ষা পালন করিত তবে জগতে কোন অশান্তি উপদ্রব হইত না। আয়েত তিনটির সার-মর্ম্ম এই ঃ—(১) কাহারো ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তৎপ্রতি লোলোপ বা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাইও না। (২) সর্ব্বদা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিও। (৩) পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া সেই ঝগড়া মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিও এবং কোন পক্ষ সেই মীমাংসা অমান্য করিলে সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিও। অতঃপর তিনি বলেন যে, কোরানের শিক্ষার অবমাননার ফলেই জগতে বর্ত্তমান অশান্তি দেখা দিয়াছে এবং কোরানের শিক্ষা পালন করিলেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

অতঃপর মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ বি-এল বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সমস্ত জগতের জন্য এবং সর্ব্বকালের জন্য, তাই তাঁর শিক্ষায় জগতের সর্ব্বকালের সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে যে-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, যে-প্রলয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়ও তাঁহার শিক্ষায় ও তাঁহার আদর্শে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের মানবতা ও সভ্যতা যে বিপদের সম্মুখীন তদপেক্ষাও বৃহত্তর বিপদ হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) সম্মুখে ছিল। তিনি ছিলেন সহায় সম্বলহীন, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন এক এতীম বালক, আর তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল জগতের সমস্ত শক্তি ও সমস্ত কৌশল। কিন্তু তিনি এইরূপ নিঃসহায়, নিঃসম্বল হইয়াও বিরুদ্ধ শক্তির উপর জয়ী হইয়াছিলেন কেবল ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, ন্যায়-নিষ্ঠা ও প্রার্থনার বলে। অতঃপর তিনি তাঁহার জীবনের কতিপয় ঘটনা হইতে তাঁহার এই অটল বিশ্বাস, ন্যায়-নিষ্ঠা ও প্রার্থনার প্রভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান এই মহা সঙ্কটে আমাদের জন্য তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শে শিক্ষা ও প্রেরণা রহিয়াছে। এই মহা-বিপদেও যদি আমরা তাঁহার আদর্শের অনুসরণ-করতঃ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঈশ্বরের অস্তিতে ও সাহায্যে অটল বিশ্বাস রাখি এবং তাঁহার নিকট আকুল প্রাণে প্রার্থনা করি তবে নিশ্চয়ই আমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি। প্রবল পরাক্রমশালী কোরেশ জাতি ও পারস্য সম্রাটের হাত হইতে আল্লাহ্ যেমন অলৌকিক ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তেমনি বর্ত্তমান যুগের জালেম পরাক্রমশালী শক্তির হাত হইতেও তিনি মানবজাতিকে রক্ষা করিতে পারেন।

একটি বিশেষ আপীল

আহমদী ভাই ও ভগ্নিগণ অবগত আছেন যে, কাদিয়ানীরদ পুস্তকের প্রতিবাদে আমাদের মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব যে কিতাবখানা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা ছাপানের কাজ খুব দ্রুত চলিতেছে। যে-সমস্ত আহমদী ভাই ও ভগ্নিগণ এই কিতাবখানা ছাপানের কাজে যে-ভাবে সহায়তা করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই পূরণ করিয়া ফেলুন। কিতাবখানা ছাপার প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, অনুমান আরও ৪০০ পৃষ্ঠা বাকী আছে। এই ৮০০ পৃষ্ঠার একখানা কিতাব ছাপানের খরচ নিতান্ত কম নহে। টাকার আশু প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত এই কিতাবখানার মধ্যে আমাদের সুযোগ্য মৌলানা সাহেব যে-ভাবে ইমাম মাহদী ও মসিহ সম্বন্ধীয় বহু ও বিভিন্ন হাদীছের প্রকৃত মর্ম্ম সপ্রমাণ ও উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং হজরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যে-ভাবে বিরুদ্ধবাদীদের এতেরাজগুলির যথাবিহিত যুক্তিপূর্ণ ও স-প্রমাণ উত্তর দিয়াছেন তাহাতে ন্যায়-পরায়ণ গয়ের-আহমদী ভ্রাতাগণও কায়েল না হইয়া পারিবেন না।

অন্ততঃ প্রত্যেক আহমদীর হাতে হাতে এই কিতাবখানার এক-এক কপি থাকার নিতান্তই দরকার। আশা করি, প্রত্যেক আহমদী এইজন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবখানার নাম 'হাদীছুল-মাহদী' রাখা হইয়াছে।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

(চতুর্থ পৃষ্ঠা হইতে)

অতএব যে-ব্যক্তি দ্বীনের কাজের জন্য নিজের হৃদয়ে আনন্দ না পায় তাহাকে সকলের প্রথম ওজু করিয়া দুই রেকাত, নামাজের জন্য দাড়াইয়া যাওয়া উচিত এবং এই দোয়া করা উচিত—হে আল্লাহ! 'দ্বীনের কাজের জন্য আমার হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি নাই, দ্বীনের বোঝা বহন করিবার আমার কোন সুযোগও লাভ হয় না, তুমি নিজ অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে দ্বীনের কাজের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া দাও এবং এই সকল ভার বহন করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা আমাকে দান কর, যেন পরকালে তুমি আমার সকল ভার বহন কর

হজরত আমীরুল-মোমেনীন, খলিফাতুল-মসিহ কর্ত্তৃক

তাহরিক-জদীদের সপ্তম বর্ষের ঘোষণা

কয়েক ঘণ্টায় দুই হাজার টাকা নকদ এবং পনর হাজার টাকা ওয়াদাপ্রাপ্তি

বন্ধুগণ সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা প্রেরণ করুন

বিস্তারিত খোৎবা ইনশা-আল্লা—আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে

কাদিয়ানে সালানা জলসা বা মহা ধর্ম্ম-সম্মেলন

আগামী ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর

বন্ধুগণ নিজ নিজ চাঁদা সত্বর আদায় করুন

স্বয়ং যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে প্রস্তুত করুন

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).